BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120018

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

Rajkumar Bhunia

State Aided College Teacher, Uluberia College, Uluberia, Howrah, Email: rajkumarbhunia059@gmail.Com

& Research Scholar, Panskura Banamali College (Autonomous), Affiliated to Vidyasagar University

সারসংক্ষেপ:

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল ভিত্তি ছিল শিক্ষার সার্বজনীনতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োগ। তৎকালীন সমাজে শিক্ষা যেখানে উচ্চবর্ণ ও পুরুষকেন্দ্রিক ছিল, সেখানে বিদ্যাসাগর শিক্ষা ব্যবস্থাকে নারী, নিম্নবর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করার সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিশেষত বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিক্ষাকে সহজ, বোধগম্য ও গণমুখী করে তোলেন। বর্ণপরিচয় সহ তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি যুক্তিবোধ, নৈতিকতা ও মানবিক চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই গবেষণা প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন ও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার ধারণাকে বিশ্লেষণ করে তা সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষানীতি, বহুভাষিকতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আলোচনায় বিদ্যাসাগরের চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক ও পথনির্দেশক। প্রবন্ধটি দেখাতে চেয়েছে যে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও জ্ঞানার্জনের গভীরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব, সমকালীন শিক্ষাচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা একটি কার্যকর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

মূল শব্দ: *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিক্ষাদর্শন, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সমকালীন শিক্ষানীতি।*

ভূমিকা:

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজ ছিল এক গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক রূপান্তরের যুগ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তাধারার আগমন ঘটে, অন্যদিকে তেমনি দেশীয় সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-পদ্ধতি ও ভাষা গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়। এই দ্বন্দ্বময় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যাঁরা নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হন, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত বিদ্যাসাগর—তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি কেবল একজন অসাধারণ পণ্ডিত বা শিক্ষাবিদই ছিলেন না, বরং ছিলেন এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজসংস্কারক, ভাষাবিজ্ঞানী ও মানবতাবাদী চিন্তাবিদ, যাঁর চিন্তা ও কর্ম বাংলা তথা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে এক নতুন দিশা প্রদান করে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং মানুষের নৈতিক বিকাশ, সামাজিক সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ গঠনের প্রধান

উপায়। সেই কারণে তিনি শিক্ষাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণভেদ, লিঙ্গবৈষম্য ও সামাজিক অসাম্যের ঊর্ধ্বে তুলে একটি সর্বজনীন মানবিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার।

বিশেষত ভাষার প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের অবদান অনন্য ও যুগান্তকারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার সম্ভব নয় যদি তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশিত না হয়। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ—বিশেষ করে *বর্ণপরিচয়*—বাংলা ভাষার শিক্ষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে এবং শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসে। এই মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাভাবনা কেবল ভাষাগত সংস্কার নয়, বরং একটি গভীর শিক্ষাদর্শনিক অবস্থানকে নির্দেশ করে, যেখানে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও ভাষা-সংক্রান্ত চিন্তাধারা তাঁর সময়কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর দর্শনের প্রতিফলন পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং আধুনিক শিক্ষানীতির নানা স্তরে লক্ষ্য করা যায়। আজকের সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় যখন শিক্ষার গুণগত মান, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে, তখন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে তাঁর শিক্ষাভাবনা ও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার দর্শনকে পুনর্মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ভারতীয় শিক্ষা ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন—এক এমন সময়ে, যখন ভারতীয় সমাজ ছিল গভীর সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও শিক্ষাগত সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষার সুযোগ প্রধানত উচ্চবর্ণ ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে সাধারণ মানুষ, বিশেষত নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এই প্রতিকূল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাকে সামাজিক পুনর্গঠনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কল্পনা করেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের অন্যতম প্রধান দিক ছিল শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার। তিনি এমন এক সময়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটান, যখন শিক্ষাকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হতো এবং তা ছিল উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার। এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—শিক্ষা কোনো বিশেষ শ্রেণির সম্পত্তি নয়, বরং মানবজাতির মৌলিক অধিকার।

ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার দীর্ঘ, জটিল ও প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সহজ, প্রাঞ্জল ও যুক্তিনির্ভর শিক্ষার সূচনা করেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষাকে শিশু ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য করে তোলে। এই ভাষাভিত্তিক সংস্কার কেবল শিক্ষার বিস্তারই ঘটায়নি, বরং বাংলা ভাষাকেও একটি আধুনিক শিক্ষার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

শিক্ষাকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন এবং একই সঙ্গে নিম্নবর্ণ ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হন। তাঁর এই উদ্যোগ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত বর্ণবিভাগ ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রতিবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সার্বিকভাবে বিচার করলে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা ও সংস্কার কর্মসূচি তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণভিত্তিক বিভাজন ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট মানবতাবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তাঁর শিক্ষা দর্শন যুক্তি, সহানুভূতি ও মানবিক মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা তাঁকে উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও শিক্ষাসংস্কারকে রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের মূল ভিত্তি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন মূলত মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও সামাজিক ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল কেবল পাঠ্যজ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের একটি মৌলিক মাধ্যম। শিক্ষাকে তিনি এমন একটি শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যা সামাজিক বৈষম্য দূর করতে পারে এবং মানুষের মধ্যে সমান মর্যাদা ও মানবিক চেতনা গড়ে তুলতে সক্ষম।

শিক্ষার সার্বজনীনতা এবং মানবিক দিক:

বিদ্যাসাগর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা কোনো শ্রেণি, ধর্ম বা লিঙ্গভিত্তিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তৎকালীন সমাজে শিক্ষা যেখানে প্রধানত উচ্চবর্ণের বিশেষাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতো, সেখানে বিদ্যাসাগর এই ধারণার বিরোধিতা করে শিক্ষার সার্বজনীন অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর উদ্যোগে নিম্নবর্ণের ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। এই সিদ্ধান্ত কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক স্তরেও বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

এছাড়াও বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই অস্পৃশ্যতার ধারণা দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষা গ্রহণকে মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, যেখানে সামাজিক পরিচয় নয়, বরং মানবিক মর্যাদাই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর শিক্ষাদর্শনকে এক আধুনিক ও প্রগতিশীল রূপ প্রদান করে।

মাতৃভাষাকে শিক্ষা-মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব প্রদান:

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই সর্বাধিক স্বাভাবিক ও কার্যকরভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সেই কারণে তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, যা ছিল সহজ, প্রাঞ্জল ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *বর্ণপরিচয়* সহ তাঁর অন্যান্য রচনাসমূহ শিশুদের শেখার প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক করে তোলে।

বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, অপরিচিত বা কৃত্রিম ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান শিক্ষার্থীর বোধশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে, যেখানে মাতৃভাষা চিন্তা, যুক্তি ও সৃজনশীলতার স্বাভাবিক বিকাশে সহায়ক। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আজকের জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP)-এ মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চিন্তার সুস্পষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচর্চা: দর্শন থেকে বাস্তবে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো—তিনি কেবল তাত্ত্বিক চিন্তায় সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তাঁর দর্শনকে বাস্তব শিক্ষাচর্চার মাধ্যমে কার্যকর রূপ দিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা প্রমাণ করে যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-ভাবনা ছিল প্রয়োগমুখী ও সমাজকেন্দ্রিক।

পাঠ্যপুস্তক রচনা:

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের একটি মৌলিক দিক ছিল উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তক রচনা। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে *বর্ণপরিচয়* বাংলা ভাষায় অক্ষরজ্ঞান শেখানোর ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে ভাষা শিক্ষাকে সহজ, ক্রমানুসারী ও শিশুমনের উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রথাগত মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে বোধভিত্তিক শিক্ষার সূচনা করে।

এছাড়াও *বোধোদয়, কথামালা* ও *ঋজুপাঠ* প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর একটি সুসংহত পাঠক্রম নির্মাণ করেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা ধাপে ধাপে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়। এই গ্রন্থসমূহ কেবল ভাষা শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, যুক্তিবোধ ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন:

পাঠ্যপুস্তক রচনার পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বহু মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন জেলাশাসক শ্রীচন্দ্রনাথ সরকার, সমাজসেবী শ্রীমন্ত চন্দ্রলেখা দাস, এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক শ্রীচন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের সহযোগিতায় প্রায় ২০টি মডেল স্কুল গ্রামীণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা তৎকালীন সমাজে শিক্ষার বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বিদ্যাসাগর মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার একটি কার্যকর রূপরেখা বাস্তবায়ন করেন। তিনি শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উপযুক্ত পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের চেষ্টা করেন। বিশেষত গ্রামীণ ও নারীশিক্ষার প্রসারে এই বিদ্যালয়গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, যা বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়।

সমকালীন শিক্ষা ও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশের ফলে সমকালীন শিক্ষা আজ এক নতুন দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য এখন কেবল তথ্য সরবরাহ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষা একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত মাতৃভাষা শিক্ষার্থীর চিন্তা-প্রক্রিয়া, আবেগ ও বোধশক্তির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকায় শিক্ষার গুণগত সাফল্যের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদর্শন আজ নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

আধুনিক শিক্ষানীতি এবং ভাষা:

আধুনিক শিক্ষানীতিতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে শিক্ষা কার্যকর ও টেকসই হয় তখনই, যখন তা শিক্ষার্থীর পরিচিত ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আজকের যুগে শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত গণিত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা বিদেশি ভাষার জটিল ধারায় প্রবেশ করলেও, তাদের মানসিক প্রস্তুতি ও বৌদ্ধিক ভিত্তি গড়ে ওঠে মূলত মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে। মাতৃভাষা শিক্ষার্থীর চিন্তাকে স্বাভাবিক গতিশীলতা প্রদান করে এবং নতুন ধারণা আত্মস্থ করার জন্য একটি শক্তিশালী মানসিক কাঠামো নির্মাণ করে।

বিদ্যাসাগরের ভাষাভিত্তিক শিক্ষাদর্শনের এই দিকটি আধুনিক শিক্ষানীতির সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অপরিচিত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীর বোধশক্তিকে সীমিত করে, যেখানে মাতৃভাষা চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তির বিকাশে সহায়ক। সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি বা প্রমিত ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীরা একই সঙ্গে স্থানীয় ভাষাজ্ঞান ও বিশ্বজনীন জ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারে।

এছাড়া মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। ধারণাগত স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা মুখস্থনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমূলক শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই কারণেই আজ

আধুনিক শিক্ষানীতিতে ভাষাকে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং জ্ঞান নির্মাণের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বহুভাষিকতা ও শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি:

সমকালীন জ্ঞান-অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষাকাঠামোতে বহুভাষিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা কেবল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য নয়, বরং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষাভিত্তিক ও বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাকে আরও গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীর আত্মপরিচয় ও আত্মধারণ ক্ষমতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় শিক্ষা লাভ করে, তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ গভীর হয়। একই সঙ্গে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা বিনা সংকোচে প্রশ্ন করতে, মত প্রকাশ করতে ও জ্ঞানসাধনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে শিক্ষার গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও স্থায়িত্বও বজায় থাকে।

এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি শুধুমাত্র প্রাচীন জ্ঞান ও সাহিত্য সংরক্ষণ করে না, বরং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, ভাষাগত ক্ষমতা, এবং শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধিতে সহায়ক। সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষাকে আরও গভীর ও শৃঙ্খলিত করে, যা মাতৃভাষা ও বহুভাষিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে।

বর্তমানে ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থা বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করছে, কারণ এটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষালাভের সুযোগ সম্প্রসারিত করে। বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশে জাতীয় শিক্ষানীতির স্তরে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বিদ্যাসাগরের মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাভাবনা কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না, বরং সমকালীন শিক্ষার বাস্তব সমস্যার কার্যকর সমাধান হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষার উন্নয়নে প্রচেষ্টা

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার পুনর্গঠন এবং উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তিনি বাঙালি শিক্ষার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে সহজ, প্রাঞ্জল এবং বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তুলতে কাজ করেছেন। বিদ্যাসাগরের ইংরেজি শিক্ষার জ্ঞান তাকে বাংলা ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সহায়তা করেছে।

ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি পশ্চিমা শিক্ষাদর্শন, বিজ্ঞান ও যুক্তির ধারায় দক্ষ হয়েছিলেন। এই জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি বাংলার সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন ধারণা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। যেমন, বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও সুসংগঠিত পাঠ্যপুস্তক রচনা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যিক শৈলীতে সংস্কার আনা, এবং বাংলাকে শিক্ষার আধুনিক মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজি ভাষার ধারায় প্রাপ্ত সংজ্ঞা, যুক্তি ও ব্যাকরণবিদ্যা তাকে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ ও শিক্ষণযোগ্য করতে সাহায্য করেছিল।

বিন্যাস এবং শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি শিক্ষার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে আরও সুসংগঠিত ও প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। এর ফলে বাংলা ভাষা শুধু সাহিত্যিকভাবে নয়, শিক্ষামূলক ও সামাজিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা বাংলা ভাষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও বর্তমান শিক্ষা-চ্যালেঞ্জ: তুলনামূলক অভিমত

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থা একাধিক জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—যার মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, গুণগত মানের অবনমন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গবেষক থেকে শুরু করে সরকারি নীতি নির্ধারকরা ক্রমশ একমত হচ্ছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আজ সময়ের অন্যতম প্রধান দাবি। এই সমসাময়িক উপলব্ধির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনার গভীর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হলো—শিক্ষা তখনই কার্যকর হয়, যখন তা শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিদ্যাসাগর বহু আগেই এই সত্য অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা কোনো বিশেষ শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না; বরং তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত হওয়া আবশ্যক। আজকের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (inclusive education) ধারণা এই বিদ্যাসাগরীয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিরই আধুনিক রূপ।

ভাষাগত নিরুপায়তা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অপরিচিত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে বহু শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরেই ঝরে পড়ে অথবা জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর এই সমস্যার সমাধান হিসেবে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, ভাষা কোনো নিরপেক্ষ মাধ্যম নয়; বরং তা শিক্ষার্থীর চিন্তা, বোধ ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের কাছেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

এছাড়া শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক পাঠ্যকৌশলের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। বিষয়বস্তুর গভীর উপলব্ধি, সমালোচনামূলক চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীর ভাষাগত স্বাচ্ছন্দ্য অপরিহার্য। বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষাপদ্ধতি এই ধারণারই বাস্তব প্রয়োগ, যেখানে ভাষা ছিল জ্ঞান নির্মাণের প্রধান উপকরণ।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন আজও সমকালীন শিক্ষাচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এক কার্যকর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁর চিন্তায় শিক্ষা মানেই মানবিকতা, যুক্তিনির্ভর বোধ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি—যা আধুনিক শিক্ষানীতির মূল স্তম্ভ হিসেবেও স্বীকৃত। অতএব, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা একটি মূল্যবান পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহার:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু এক সফল শিক্ষাবিদ ছিলেন না; তিনি ছিলেন একটি মানবিক শিক্ষা দর্শনের জনক, যিনি শিক্ষা-সমাজ-ভাষা — এই তিনটি স্তম্ভকে একত্রে মিলিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাঁর মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাচিন্তা আজও সমসাময়িক শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি, যা সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা ন্যায্য, সহজ ও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ (১৯৯৩), *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: জীবন ও কর্ম*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৮৫৫), *বর্ণপরিচয়*, কলকাতা।
- সেন, সুকুমার (২০০১), *বাংলা ভাষার ইতিহাস*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- ঘোষ, অমলেন্দু (১৯৮৭), *বাংলার নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

- চক্রবর্তী, সুমিতা (২০১0), *নারীশিক্ষা ও বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
- মুখোপাধ্যায়, আশিস (২০০৫), *শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: বাণীশিল্প।
- সরকার, বিমল (২০১২), *মাতৃভাষা ও শিক্ষার বিকাশ*, কলকাতা: সাহিত্যলোক।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (১৯৯৮), *উনিশ শতকের বাংলা ও বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- রায়, অঞ্জন (২০১৫), *ভাষা, শিক্ষা ও জাতিসত্তা*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
- দত্ত, সুপ্রিয়া (২০১৮), *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও ভারতীয় প্রেক্ষাপট*, কলকাতা: নিউ বুক এজেন্সি।

Citation: **Bhunia. R.,** (2025) "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনায় মাতৃভাষার গুরুত্ব", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.